অষ্টম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে নিজের ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন ও ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন। আজ রবিবার, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, কৃষ্ণা পঞ্চমী; ২৭শে মে, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। বেলা ৯টা হইবে। ভক্তেরা ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টার প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি) -- বিদ্বেষভাব ভাল নয়, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক এরা ঝগড়া করে, সেটা ভাল নয়। পদ্মলোচন বর্ধমানের সভাপণ্ডিত ছিল; সভায় বিচার হচ্ছিল, -- শিব বড় না ব্রহ্মা বড়। পদ্মলোচন বেশ বলেছিল -- আমি জানি না, আমার সঙ্গে শিবেরও আলাপ নেই, ব্রহ্মারও আলাপ নেই। (সকলের হাস্য)

“ব্যাকুলতা থাকলে সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। তবে নিষ্ঠা থাকা ভাল। নিষ্ঠাভক্তির আর-একটি নাম অব্যভিচারিণী ভক্তি। যেমন এক ডেলে গাছ, সোজা উঠেছে। ব্যভিচারিণী ভক্তি যেমন পাঁচ ডেলে গাছ। গোপীদের এমনি নিষ্ঠা যে, বৃন্দাবনের মোহনচূড়া, পীতধড়াপরা রাখালকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু ভালবাসবে না। মথুরায় যখন রাজবেশ, পাগড়ি মাথায় কৃষ্ণকে দর্শন করলে তখন তারা ঘোমটা দিলে। আর বললে, ইনি আবার কে? এঁর সঙ্গে আলাপ করে আমরা কি দ্বিচারিণী হব?

“স্ত্রী যে স্বামীর সেবা করে সেও নিষ্ঠাভক্তি, দেবর ভাসুরকে খাওয়ায়, পা ধোয়ার জল দেয়, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে অন্য সম্বন্ধ। সেইরূপ নিজের ধর্মতেও নিষ্ঠা হতে পারে। তা বলে অন্য ধর্মকে ঘৃণা করবে না। বরং তাদের সঙ্গে মিষ্ট ব্যবহার করবে।”

[*জগন্মাতার পূজা ও আত্মপূজা -- ‘বিপদনাশিনী’ মন্ত্র ও নৃত্য*]

ঠাকুর গঙ্গাস্নান করিয়া কালীঘরে গিয়াছেন। সঙ্গে মাস্টার। ঠাকুর পূজার আসনে উপবিষ্ট হইয়া, মার পাদপদ্মে ফুল দিতেছেন, মাঝে মাঝে নিজের মাথায়ও দিতেছেন ও ধ্যান করিতেছেন।

অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর আসন হইতে উঠিলেন। ভাবে বিভোর, নৃত্য করিতেছেন। আর মুখে মার নাম করিতেছেন। বলিতেছেন, “মা বিপদনাশিনী গো, বিপদনাশিনী!” দেহধারণ করলেই দুঃখ বিপদ, তাই বুঝি জীবকে শিখাইতেছেন তাঁহাকে ‘বিপদনাশিনী’ এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কাতর হইয়া ডাকিতে।

[*পূর্বকথা -- শ্রীরামকৃষ্ণ ও ঝামাপুকুরের নকুড় বাবাজী*]

এইবার ঠাকুর নিজের ঘরের পশ্চিম বারান্দায় আসিয়া উপবিষ্ট হইয়াছেন। এখনও ভাবাবেশ রহিয়াছে। কাছে রাখাল, মাস্টার, নকুড়, বৈষ্ণব প্রভৃতি। নকুড় বৈষ্ণবকে ঠাকুর ২৮/২৯ বৎসর ধরিয়া জানেন। যখন তিনি প্রথম কলিকাতায় আসিয়া ঝামাপুকুরে ছিলেন ও বাড়ি বাড়ি পূজা করিয়া বেড়াইতেন, তখন নকুড় বৈষ্ণবের দোকানে আসিয়া মাঝে মাঝে বসিতেন ও আনন্দ করিতেন। পেনেটীতে রাঘব পণ্ডিতের মহোৎসবে উপলক্ষে নকুড় বাবাজী ইদানীং ঠাকুরকে প্রায় বর্ষে বর্ষে দর্শন করিতেন। নকুড় ভক্ত বৈষ্ণব, মাঝে মাঝে তিনিও মহোৎসব দিতেন। নকুড়

মাস্টারের প্রতিবেশী। ঠাকুর ঝামাপুকুরে যখন ছিলেন, গোবিন্দ চাটুজ্যের বাড়িতে থাকিতেন। সেই পুরাতন বাটী নকুড় মাস্টারকে দেখাইয়াছিলেন।

[*শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার নামকীর্তনানন্দে*]

ঠাকুর ভাবাবেশে গান গাইতেছেন:

কীর্তন

১। সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী।
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ, আপনি দাও মা করতালি ॥
আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা শশিভালি।
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন (তুই) মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ॥
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার তন্ত্রে চলি।
যেমন করাও তেমনি করি মা, যেমন বলাও তেমনি বলি ॥
নির্গুণে কমলাকান্ত দিয়ে বলে মা গালাগালি।
সর্বনাশী ধরে অসি ধর্মাধর্ম দুটো খেলি ॥

২। আমার মা ত্বং হি তারা
তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
আমি জানি মা ও দীন-দয়াময়ী, তুমি দুর্গমেতে দুখহরা।
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি জগধাত্রী, গো মা
তুমি অকুলের ত্রাণকর্ত্রী, সদাশিবের মনোরমা।
তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমি আদ্যমূলে গো মা
আছ সর্বঘটে অর্ঘ্যপুটে সাকার আকার নিরাকারা।

৩। গোলমালে মাল রয়েছে, গোল ছেড়ে মাল বেছে নাও।

৪। মন চল যাই, আর কাজ নাই, তারাও ও তালুকে রে!

৫। পড়িয়ে ভবসাগরে, ডোবে মা তনুর তরী;
মায়া-ঝড় মোহ-তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী।

৬। মায়ে পোয়ে দুটো দুখের কথা কি।
কারুর হাতির উপর ছি, কারু চিঁড়ের উপর খাসা দই।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলিতেছেন, সংসারীদের সম্মুখে কেবল দুঃখের কথা ভাল নয়। আনন্দ চাই। যাদের অন্নাভাব, তারা দুদিন বরং উপোস করতে পারে; আর যাদের খেতে একটু বেলা হলে অসুখ হয়, তাদের কাছে কেবল কান্নার কথা, দুঃখের কথা ভাল নয়।

"বৈষ্ণবচরণ বলত, কেবল পাপ পাপ -- এ-সব কি? আনন্দ কর।"

ঠাকুর আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিতে না করিতে মনোহরসাঁই গোস্বামী আসিয়া উপস্থিত।

[*শ্রীরাধার ভাবে মহাভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণ -- ঠাকুর কি গৌরাঙ্গ!*]

গোস্বামী পূর্বরাগ কীর্তন গান করিতেছেন। একটু শুনিতে শুনিতেই ঠাকুর রাধার ভাবে ভাববিষ্ট।

প্রথমেই গৌরচন্দ্রিকা কীর্তন। "করতলে হাত -- চিন্তিত গোরা -- আজ কেন চিন্তিত? -- বুঝি রাধার ভাবে হয়েছে ভাবিত।"

গোস্বামী আবার গান গাইতেছেন:

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আসে যায়
কিবা মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্ব কাননে চায়।
(রাই, এমন কেন বা হল গো!)

গানের এই লাইনটি শুনিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাবের অবস্থা হইয়াছে। গায়ের জামা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

কীর্তনিয়া যখন গাইতেছেন:

শীতল তছু অঙ্গ।
তনু পরশে, অমনি অবশ অঙ্গ!
মহাভাবে ঠাকুরের কম্প হইতেছে!

(কেদার দৃষ্টে) ঠাকুর কীর্তনের সুরে বলিতেছেন, "প্রাণনাথ, হৃদয়বল্লভ তোরা কৃষ্ণ এনে দে; সুহৃদের তো কাজ বটে; হয় এনে দে, না হয় আমায় নিয়ে চল; তোদের চিরদাসী হব।"

গোস্বামী কীর্তনিয়া ঠাকুরের মহাভাবের অবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি করজোড়ে বলিতেছেন, "আমার বিষয়বুদ্ধি ঘুচিয়ে দিন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) -- "সাধু বাসা পাকড় লিয়া।" তুমি এত বড় রসিক; তোমার ভিতের থেকে এত মিষ্ট রস বেরুচ্ছে!

গোস্বামী -- প্রভু, আমি চিনির বলদ, চিনির আস্বাদন করতে কই পেলাম?

আবার কীর্তন চলিতে লাগিল। কীর্তনিয়া শ্রীমতীর দশা বর্ণনা করিতেছেন --

"কোকিল-কুলকুর্বতি কলনাদম্"

কোকিলের কলনাদ শুনে শ্রীমতির বজ্রধ্বনি বলে মনে হচ্ছে। তাই জৈমিনির নাম কচ্ছেন। আর বলছেন, “সখি, কৃষ্ণ বিরহে এ প্রাণ থাকিবে না -- রেখো দেহ তমালের ডালে।”

গোস্বামী রাধাশ্যামের মিলন গান গাহিয়া কীর্তন সমাপ্ত করিলেন।